Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ময়মনসিংহ-গীতিকার ভাষা : দৃষ্টির ভিন্নভঙ্গী

Volume	40
Issue	3
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ শহীদুর রহমান
Published online	April 24, 2025
DOI	10.62328/sp.v40i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.4
Pages	65-74
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ময়মনসিংহ-গীতিকার ভাষা :

Check for updates

মোঃ শহীদুর রহমান

ড. সুকুমার সেন ময়মনসিংহ-গীতিকার ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, 'পালাগুলিতে স্থানীয় উপভাষার রূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও সাধুভাষার এবং কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যে মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধুভাষার) শব্দগুলিকে পূর্ববঙ্গীয় রূপ দিবার চেষ্টা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।[১] এ প্রসঙ্গে তিনি দু'একটি উদাহরণও উপস্থিত করেছেন যে, গীতিকায় ব্যবহৃত 'নতুন' শব্দটি হওয়া উচিত ছিল 'নয়া' কিংবা 'কইরে' হওয়া উচিত ছিল 'কর‍্যা' অথবা 'বল্যা' হওয়া উচিত ছিল 'কয়্যা'।

প্রসঙ্গটি মূলত বাংলাভাষার উৎসের সঙ্গে জড়িত এবং তার বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি বিষয় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়—

১. পূর্ববঙ্গ তথা ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার উৎস কি এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহ পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা, সাধুভাষা ও উপভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে আলাদা কিনা।

২. যদি আলাদা হয় তবে পূর্ববঙ্গের বিশেষ করে ময়মনসিংহের লোক সাহিত্যের ভাষায় তার মিশ্রণ সম্ভব কিনা এবং তার পরিসংখ্যানই বা কি?

উপর্যুক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমরা আপাততঃ ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের মধ্যে ভাষাগতভাবে সবচেয়ে আধুনিক ধরনের একটি গীতিকা 'মহুয়া' পালাকে বেছে নিতে পারি। এ পালাটির সব রকম পদ বিশ্লেষণ না করে কেবল ক্রিয়া পদের ব্যবহার বিধিই লক্ষ করা যেতে পারে। কারণ ক্রিয়াপদেই একটি ভাষার বিশেষ লক্ষণ সর্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয়।

---

১ ড. সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রকাশক: শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩৪৭ সাল, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ। পৃ ১০৪৩

'মহুয়া' পালার ক্রিয়াপদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

	সংখ্যা	উদাহরণ
১. সরাসরি সাধু	৫৭২	করিয়া, পড়িয়া, লাগিল, শুনিয়া ইত্যাদি।
২. সরাসরি চলিত	৫০	করলাম, দেখলে, যাব, চাইল ইত্যাদি।
৩. পশ্চিম বঙ্গীয় আঞ্চলিক	০	—
৪. পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক	৫০২	কইর‍্যা, গাইবাম, আছিল, কয় ইত্যাদি।
৫. ব্যবহৃত সাধারণ ক্রিয়াপদ	৩২৯	কর, পরে, যায়, গেল, চল, দিয়া, নাই, গাই ইত্যাদি।

এ পালায় ক্রিয়াপদের মিশ্রণ বৈচিত্র্য নিম্নরূপ :

	সংখ্যা	উদাহরণ
১. সাধু + সাধু	৩৭	ঘুরিয়া, ফিরিয়া, পালিতে লাগিল ইত্যাদি।
২. সাধু + চলিত	১০	শুকাইয়া গেছে, লইয়া আসি ইত্যাদি।
৩. চলিত + সাধু	৬	করতে যাই, দেখতে পাও ইত্যাদি।
৪. চলিত + চলিত	০	—
৫. আঞ্চলিক + আঞ্চলিক	১৯	ভ্যাব্যাচিন্তা, কান্দিয়া কান্দিয়া ইত্যাদি।
৬. আঞ্চলিক + সাধু	৬২	কইর‍্যা খাইও, ছাইড়া যাইতে, খুজ্যা পাইল ইত্যাদি।
৭. সাধু + আঞ্চলিক	২৩	চল দেইখ্যা আই, লইয়া আইবাম।
৮. আঞ্চলিক + চলিত	৪	পাইল্যা করলাম, ফিইরা গেছে।
৯. চলিত + আঞ্চলিক	২	থাকবা বইয়া, থাকব খারা।
১০. ময়মনসিংহের আঞ্চলিক + পশ্চিম বঙ্গীয় উপভাষা	০	—

এখানে উল্লেখ্য যে, এর মধ্যেও অনেকগুলো শব্দ মূলত আঞ্চলিক, কিন্তু আধুনিক লেখকের ব্যবহার প্রক্রিয়ায় তার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র।

এখন প্রশ্ন যে, এ মিশ্রণ স্বাভাবিক কিনা কিংবা তা পশ্চিমবঙ্গীয় সাধুভাষা অথবা উপভাষার প্রভাবজাত কিনা। এখানেই আমাদের পূর্ববঙ্গীয় এবং পশ্চিম-বঙ্গীয় ভাষারীতির উৎস অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

মূলত পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষারীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এর পিছনে বিশেষ করে দু'টি ভাষাগোষ্ঠীর অবদান অনস্বীকার্য। এ ভাষাগোষ্ঠী দু'টির একটি 'মোঙ্গলীয়' যার প্রভাব পূর্ববঙ্গে এবং অপরটি দ্রাবিড় যার প্রভাব 'পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় সুক্ষ দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে অন্ধ্রদেশ পর্যন্ত'।[২] ফলে 'যতই আমরা পশ্চিম দিকে রাঢ় দেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হই ততই দ্রাবিড় ভাষার উচ্চারণ প্রভাব প্রকট হইয়া উঠে এবং যতই পূর্বাভিমুখে আসামের সুক্ষা উপত্যকা ও পার্বত্য ত্রিপুরার দিকে অগ্রসর হই ততই তিব্বত-চৈনিক ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে।'[৩]

এ সূত্র ধরেও আমরা বলতে পারি, বাংলা ভাষা জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে প্রচলিত হয়েছিল। কারণ, পৃথিবীর যে কোন ভাষাই তার আঞ্চলিক উপভাষাগুলির উপর জীবন ও সমৃদ্ধি লাভ করে।

এ কথাটিই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, 'ম্যাক্সমুলার বলিয়াছেন', The real and natural life of language is in its dialectes. অর্থাৎ ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন তাহার উপভাষাগুলিতে।[৪] অর্থাৎ আঞ্চলিক উপভাষাগুলো জীবন্ত এবং তারা তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে গতিশীল। আর এ আঞ্চলিক ভাষার গতিশীলতাকে অবলম্বন করেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে একটি জাতির সার্বজনীন ভাষা। আর এভাবেই বাঙ্গালীর সার্বজনীন ভাষা 'বাংলা ভাষা' গড়ে উঠেছিল একদিন পূর্ববঙ্গে। শুধু তাই নয় সে ভাষার সাহিত্যও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেখানেই। এ প্রসঙ্গেও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন :

> বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান প্রাচীন গৌড় বা বরেন্দ্র এবং বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশ লইয়া গঠিত। প্রাচীন বাংলা ভাষার আদি লেখক মস্যেন্দ্রনাথ চন্দ্রদ্বীপের (বাখরগন্জ জেলার) অধিবাসী ছিলেন।

---

২ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য: শব্দ ও উচ্চারণ। গ্রন্থ নিকেতন: ১৯২ ডি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৪৩। পৃ ৭২

৩ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : প্রাগুক্ত পৃ ৭৩

৪ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্: বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (ভূকিমাংশ)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ: ১৩৭২ : ১৯৬৫

চর্যাপদগুলির অধিকাংশ রচয়িতা আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি পূর্ব পাকিস্তানে।

বর্তমান পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ় দেশে প্রথমে শূর রাজবংশ এবং পরে সেন রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা দেশী ভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন এবং সংস্কৃতের উৎসাহদাতা ছিলেন। এই কারণে রাঢ় বা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীনকালে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভব হয় নাই; কিন্তু প্রাচীন গৌড় এবং বঙ্গে বা বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম রাজত্বের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।'[৫]

আর কোন জাতির ভাষায় এই শ্রীবৃদ্ধিকে উপলব্ধি করতে গেলে 'সেই জাতির অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, সভ্য, সুসভ্য প্রভৃতি সকল অবস্থার চিত্র জিজ্ঞাসুর হস্তগত হওয়া চাই।' একথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যথার্থই প্রযোজ্য।

পৃথিবীর যে কোন ভাষা জন্ম থেকেই সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং তা নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ মান সম্মত পর্যায়ে উন্নীত ও সর্বজনগ্রাহ্য হবার পরেই তা তার জাতীয় সাহিত্যে স্থান করে নেয়। একথা বাংলা ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং এ আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে প্রাচীনকাল থেকেই পূর্ববঙ্গের ভাষা-সাহিত্যই কালক্রমে সর্ববঙ্গীয়রূপে চর্যাপদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং চর্যাপদের এ ভাষাই বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক এবং আমরা এ সূত্র ধরে উক্ত পদের ভাষা-স্বরূপ আবিষ্কারার্থে তাতে বিধৃত সাধু ক্রিয়াপদের ব্যাকরণ ব্যবহার এবং সাধু চলিত রূপের মিশ্রণ লক্ষ করবো:

১. কাহ্ন কহিঁ গই করিব নিবাস।
.. .. ..
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবনাগবণে কাহ্ন বিমন ভইলা।।
কাহ্ন পাদানাম (৭নং পদ)

---

৫ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : প্রাগুক্ত
রমাপ্রসাদ চন্দ্র : ইতিহাসে বাঙালী। প্রাগুক্ত। পৃ ৩৪

২. দশমি দুআরত চিহ্ন দেখিয়া
আইল গরাহক আপনে বহিআ।।
বিরুপাদানাম (৩নং পদ)[৬]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ে 'করিব', 'আইলা', 'গেলা', 'ভইলা', 'দেখিয়া', 'আইল', 'বহিআ' ক্রিয়াপদ ব্যবহারে সাধু-আঞ্চলিক তথা সাধু-কথ্য ভাষা মিশ্রণের বিশেষ রীতি লক্ষণীয়। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চর্যাপদের ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষার বিশিষ্ট রীতিটি রক্ষিত হয়েছে এবং এ রীতিই মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্য তথা ময়মনসিংহ-গীতিকায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

১. 'কোন দেশ ছাড়িয়া তুমি আইলা এমন দূরে।।
কোনবা রাজার কন্যা দিলা বনবাসে।
কিবা পাপ কইরা ছিল নবীন বয়সে।।[৭]
.. .. ..
বাড়ীঘর ছাইড়া ঠাকুর আইল কন্যার লাগি।'
(মহুয়া)

২. 'পুত্ররে শীগারে দিয়া পাগল হইলা মাও।'[৭]
(মলুয়া)

এখানে 'ছাড়িয়া', 'আইলা', 'দিলা', 'ছিলা', 'আইল', শব্দগুলো উদ্ধৃত চর্যাপদের 'করিব', 'আইলা', 'গেলা', 'ভইলা', 'দেখিয়া', 'বহিআ' প্রভৃতির আদল রক্ষা করেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায়ও আমরা কথ্য আঞ্চলিক সাধুরীতির মিশ্রণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি :

'সব দেবে মেলি সভা পাতিল আকাশে।
.. .. ..
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে।।

---

* রমাপ্রসাদ চন্দ্র : ইতিহাসে বাঙালী। প্রকাশক : (কপি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ: ১৯৮১। পৃ ৩৪

৬ Muhammad Shahidullah : Buddist Mystic Songs. Published by: A.F.M. Sofiyyullah and printed by M. Raziyullah at Renaissance Printers. Dacca. Reprinted : June, 1974. P. 21, P. 8

৭ ড. দীনেশচন্দ্র সেন : মৈমনসিংহ-গীতিকা। পৃঃ ৩২, ৪১, ৪৯

তোহ্মে নানারূপ কইলে আসুরের খএ।

. . . . . .

হেন শুনী ঈসত হাসিআঁ ততিখনে।
এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে।'[৮]

এখানে 'পাতিল', 'হৈবে', 'হাসিয়া', ক্রিয়াপদগুলো সাধুভাষার আদলে এবং 'মেলী', 'শুনী', 'লআঁ', 'গেলান্তি', 'কইলে' প্রভৃতি কথ্য-আঞ্চলিক প্রভাবপ্রসূত। এ ধরনের মিশ্রিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার চর্যাপদেও লক্ষণীয় :

পাঞ্চ কেড়ুয়াল পড়ন্তে মাঙ্গে পীঠত কাছী বান্ধী। (১৪নং পদ)[৯]
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। (১৭নং পদ)[৯]
পুন লইআঁ আপনা চটারিউ। (২৬নং পদ)[৯]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে নিম্নরেখ শব্দগুলোর সাদৃশ্য বিবেচনায় তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত ও একই গোষ্ঠীসম্ভূত বলে মনে হয়। তবে উৎসের দিক থেকে চর্যাপদ পূর্ববঙ্গীয় এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পশ্চিমবঙ্গীয়। আবার কালগতভাবে চর্যাপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহুপূর্বে এবং অধিকাংশ চর্যার ভাষা পূর্ববঙ্গোদ্ভূত। শুধু তাই নয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা চর্যাপদের ভাষার লক্ষণাক্রান্ত। অতএব, ভাষা পর্যালোচনায় চর্যাপদের ভাষার প্রভাবই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পড়া অসম্ভব কিছু নয়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়েছে কিংবা চর্যাপদের ভাষাই বিকশিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় উন্নীত হয়েছে বললেও অযৌক্তিক হয় না। তাছাড়া, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা বলতে পারি, ম্যস্যেন্দ নাথ প্রবর্তিত নাথধর্ম এক সময় গোটা ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এই ম্যস্যেন্দ্রনাথ বাখরগন্জ জেলার অধিবাসী এবং একজন বিখ্যাত চর্যাগীতিকার। কাজেই তার রচিত পদ তথা ধর্ম প্রচারার্থে পূর্ববঙ্গের ভাষা পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় যথার্থই প্রভাব বিস্তার করেছে বলেও ধারণা জন্মে।[১০] অর্থাৎ আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় পড়াই স্বাভাবিক ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তবে এতদসঙ্গে আমরা একথাও পরখ করে দেখবো যে, পূর্ববঙ্গের ভাষা পশ্চিমবঙ্গের ভাষা কর্তৃক প্রভাবিত কিনা?

---

৮ চণ্ডীদাস (বসন্তরঞ্জন রায়বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত) : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩/১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা। সপ্তম সংস্করণ- ১৩৬৮। পৃ ১

৯ Muhammad Shahidullah : Ibid P. 43, 53, 73

১০ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্: বাংলা সাহিত্যের কথা। প্রকাশক: মাহমুদ যকীয়ুল্লাহ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১০ নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ। এপ্রিল, ১৯৫৩। শোভন সংস্করণ-আগষ্ট, ১৯৫৮। পৃ ১৩

এ পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার প্রশ্নটিকে এভাবে গ্রহণ না করে বরং একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলা যায়, আধুনিককালে বাংলা ভাষায় সাধু-চলতি রীতির ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির বহু পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের ভাষা বা বাংলা ভাষার স্বরূপই ছিল উভয়বিধ ভাষারীতির মিশ্রণমাত্র। 'অর্থাৎ এ শিষ্ট সাধারণ আদর্শের উপভাষাগত বিভেদ তখনও পরিলক্ষিত হয়নি।'[১১] আর এটাই পূর্ববঙ্গীয় লোকজ ভাষা, সাহিত্য তথা লোক-সাহিত্যের ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং এ বৈশিষ্ট্যই শুর ও সেন রাজবংশের উন্নাসিকতায় কিংবা আভিজাত্যের অহমিকায় দুঃখজনকভাবে পদদলিত হয়েছিল।[১২] তবে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ তাদের মাতৃভাষাকে মুখে মুখে ও কবি সাহিত্যিকগণ চর্যাপদ কিংবা মধ্যযুগীয় বিভিন্ন লোক সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে যত্নের সঙ্গে ধরে রেখেছিল সন্দেহ নেই। উপরন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে : যে-কোন জীবন্ত ভাষাই তার লোকজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্যদিয়ে জাতীয় সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেক্ষেত্রে 'বঙ্গভূমির' বা পূর্ববঙ্গীয় ভাষা কিংবা ময়মনসিংহ গীতিকার আঞ্চলিক ভাষা ব্যতিক্রম কিছু নয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যেহেতু 'বঙ্গভূমির' ভাষার সূতিকাগার পূর্ববঙ্গে এবং তার স্বরূপ আধুনিক সাধু-চলতি রীতির প্রশ্ন উত্থাপনের বহু পূর্বেই গ্রহণ বর্জনের রীতি অনুসরণে সাধু-চলিত পদ মিশ্রণে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ও সর্ববঙ্গীয়রূপে বিদ্যমান ছিল—সেহেতু পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষার কিছু কিছু শব্দ ময়মনসিংহ গীতিকার ভাষায় মিশ্রিত হওয়াই স্বাভাবিক। আর এ কারণেই, 'খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে চীন পরিব্রাজক যুআন-চুআঙ্ (হিউ এন্‌ত্ সাঙ) ভারত ভ্রমণে আসিয়া বর্তমান বঙ্গাল, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশের ভাষা প্রায় একরূপ দেখিয়াছিলেন। কামরূপ ও উড়িষ্যা অঞ্চলের ভাষায় যে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা মাত্র উচ্চারণগত।'[১৩] এ থেকে উপলব্ধি হয় যে, উচ্চারণের তারতম্য ভেদেও একই ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম মনে হতে পারে। অর্থাৎ আমরা যদি বলি উচ্চারণের তারতম্যে পূর্ববঙ্গের সাধু শব্দের মাথায় চন্দ্রবিন্দু বসে পশ্চিমবঙ্গীয় ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়ে শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটিয়েছে সে-কথাও তাৎক্ষণিকভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অধিকন্তু কবি-সাহিত্যিকদের স্বকীয় ভাষা উন্নয়নের প্রচেষ্টা কিংবা পরিবেশ অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারের প্রক্রিয়া অথবা ছন্দের প্রয়োজনে শব্দরূপের পরিবর্তন থেকেও এমন বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে পারে। একথা ড. সুকুমার সেনের বক্তব্যেও অনুধাবন করা যায় :

---

১১ পরেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বাঙলা ভাষা পরিক্রমা। প্রকাশক: প্রশান্ত ভট্টাচার্য, স্বারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩। পৃ ১১৯

১২ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্: আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (ভূমিকাংশ)।

১৩ বসন্তরঞ্জন রায়বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পাদিত) : চণ্ডিদাস-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (ভূমিকাংশ)। প্রকাশক: শ্রীসন্যকুমার গুপ্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড-কলিকাতা। সপ্তম সংস্করণ-১৩৬৮। পৃ ১

'মধ্য বাঙ্গালায়, কালোপযোগী পরিবর্তনের ফলে, মুখের ভাষা সাহিত্য অনুশীলনের ভাষা হইতে খানিকটা সরিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন সাহিত্য বলিতে ছন্দোবদ্ধ রচনা এবং সে ছন্দোবদ্ধ রচনা সর্বসাধারণের জন্য, এই জন্য তাহাতে সমসাময়িক মুখের ভাষার প্রবেশ অবারিত ছিল। ছন্দের প্রয়োজনে তখন সাহিত্যের ভাষায় প্রাচীন ও অর্বাচীন পদ এবং ইডিয়ম যথেষ্টই ব্যবহৃত হইত। সুতরাং যদিও মধ্য বাঙ্গালার প্রথমপর্বে সাধুভাষার (অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষার) বিকাশ ঘটিতেছিল তবুও, ষোড়শ শতাব্দের গোড়া পর্যন্ত কথ্য ভাষার সঙ্গে ভাষার ঘোর অমিল ছিল না। তাহার পর কথ্য ভাষায় স্বর ধ্বনিতে বড় রকম পরিবর্তন আসিয়াছিল। প্রথমে হইল অন্ত্যস্বর লোপ, তাহার পর মধ্য-স্বর-লোপ দুই মিলিয়া দ্বিমাত্রিকতা, অবশেষে অপিনিহিতি (বা বিপর্যাস), অপশ্রুতি ও স্বর সঙ্গতি। এই সব পরিবর্তনের সমবায়ে পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা লেখার ভাষা হইতে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই বিচ্ছেদের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা সর্বত্র সহজ নয়। কেননা পদ্যময় রচনায় ছন্দের প্রয়োজনে কথ্য ভাষার কোন উল্লেখযোগ্য গদ্য নিদর্শন রক্ষিত হয় নাই।'[১৪]

অন্যদিক আধুনিক সাধুভাষা সৃষ্টির পটভূমির বর্ণনা দিতে যেয়েও ড. সুকুমার সেন বলেন :

'যাহাকে এখন সাধু ভাষা বলা হয় তাহা ঊনবিংশ শতাব্দের সৃষ্টি হইলেও উহার আয়োজন আগের শতাব্দেই সম্ভূত হইয়াছিল। গদ্য শৈলীকে আশ্রয় করিয়াই এই সাধু ভাষার উদ্ভব, পণ্ডিত ও মুনশিদের কলমেই বাঙ্গালা সাহিত্যিক গদ্যের জন্ম ও বিকাশ। ইহারাই ইহার রচনার ভাষাকে "সাধু গৌড়ীয় ভাষা", সংক্ষেপে 'সাধুভাষা' নাম দিয়াছিলেন। এ ভাষার প্রথম হইতেই সংস্কৃতের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছিল। সংস্কৃতের প্রভাব আছে প্রথমত শব্দ চয়নে, দ্বিতীয়ত সমাসবাহুল্যে, তৃতীয়ত কথ্য ভাষার ও উপভাষার পদ পরিবর্জনে, চতুর্থত কিছু কিছু ইডিয়ম অনুসরণে।[১৫]

সাধু চলিত মিশ্রণ সম্পর্কেও ড. সেন বলেন :

১৪ শ্রীসুকুমার সেন: ভাষার ইতিবৃত্ত। প্রকাশক: শ্রীশেফালিকা রায়, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৭৫। পৃ ১৯০-৯১

১৫ শ্রীসুকুমার সেন : প্রাগুক্ত পৃ ১৯২

'সাহিত্যে ব্যবহৃত মধ্য বাঙ্গালা ও আধুনিক সাধুভাষা যে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। দুইটির মধ্যে পার্থক্য শুধু পদবিন্যাসে।

মধ্য বাঙ্গালা :

হিত উপদেশ রাজা শ্রবণ করিয়া
ধীরে ধীরে উঠিলেন শয়ন ছাড়িয়া।

সাধু ভাষা :

হিত উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা
শয়ন ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন।[১৬]

প্রসঙ্গক্রমে পূর্ববঙ্গীয় ভাষার প্রভাব যে পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় পড়েছে সে-কথাও ড. সেন উল্লেখ করেন :

'কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বলিলে চলিবে না যে অন্য উপভাষার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের লেখ্য ভাষায় মোটেই পড়ে নাই। ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকজন বিশিষ্ট কবি শ্রীহট্ট এবং চাটিগাঁ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গ অঞ্চলের উপভাষার পদ কিছু কিছু আসিয়া গিয়াছে। আমরা মুখে বলি— 'করছি' কিন্তু লিখি 'করিতেছি'। করছি পদের মূলে 'করিতেছি' পদ নয়, এটি পূর্ববঙ্গের উপভাষার পদ, ইহা হইতে পূর্ববঙ্গের আধুনিক উপভাষায় 'কইর্‌তেছি' ও 'কর্‌ত্যাছি' আসিয়াছে। অতএব বাঙ্গালা সাধুভাষায় 'করিতেছি' পদ পূর্ববঙ্গের উপভাষা হইতে আগত।'[১৭]

ড. সুকুমার সেনের এ সব বক্তব্য থেকেও আমরা বুঝতে পারি, বাংলা ভাষা কালোপযোগী পরিবর্তিত হয়েছে, মুখের ভাষা সাহিত্যের অঙ্গন থেকে নানা কারণে খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিল, আবার জনগণের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসেও তাতে মুখের ভাষার প্রবেশ অবারিত হয়েছে, ছন্দের প্রয়োজনে প্রাচীন এবং অর্বাচীন পদ মিশ্রিত হয়েছে, অধিকন্তু সাধুভাষা ঊনবিংশ শতাব্দের সৃষ্টি এবং পূর্বে সাধুভাষার শব্দ ও কথ্য ভাষার শব্দ-মৈত্রী সংরক্ষিত ছিল। তাছাড়া উপভাষাগুলো তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই পরস্পরে সম্মিলিত হতে পারে বলেও ড. সেন মন্তব্য করেন। সুতরাং বাংলা ভাষা তথা তার আঞ্চলিক ভাষা বিকাশের ধারায় ময়মনসিংহ-গীতিকার জীবন্ত ভাষাকে কৃত্রিম ভাষা বলার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কারণ, ময়মনসিংহ-গীতিকাও তার লৌকিক ঐতিহ্য বজায় রেখেই মিশ্রিত ভাষার এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্য উজ্জীবিত রেখেছে। সেখানে একদিকে যেমন বহুবিধ কারণে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত জনমানুষের সমন্বয়ে একটি নতুন মিশ্রসমাজ গড়ে উঠেছে, তেমনি তাদের ভাষাও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণে

১৬ ড. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত। পৃ ১৯২

১৭ ড. সুকুমার সেন : প্রাগুক্ত, পৃ ৭

সমৃদ্ধ হয়ে গীতিকায় প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে আমরা সেখানে বাংলা ভাষার সর্ববঙ্গীয় স্বরূপটি যেমন অধিকতর স্পষ্ট হতে দেখি তেমনি গ্রহণ এবং বর্জনের রীতি অনুসরণে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও পরিচিত হই। কাজেই ময়মনসিংহ-গীতিকায় রাজশাহী-রংপুর-বরিশাল কিংবা কুমিল্লা-বাকেরগঞ্জ অথবা পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার শব্দও মিশ্রিত হয়েছে একথা বলা যায়।

মোটকথা, পূর্ববঙ্গীয় চর্যাপদের বিকশিত ভাষাই প্রধানত সর্ববঙ্গীয়রূপে ময়মনসিংহ-গীতিকায় প্রতিফলিত হয়েছে এবং ব্যাপকতার কারণে কিছু কিছু ভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার শব্দ অনিবার্যভাবে মিশ্রিত হয়েছে বটে—কিন্তু প্রভাব বিস্তার করেনি। এ কথাই ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার আরো বিস্তৃতভাবে বলেন :

> 'পূর্বেই বলা হয়েছে যে মধ্য বাঙলার সার্বজনীন আদর্শে আঞ্চলিক লক্ষণ (শিষ্ট বা মৌখিক) অবাধে মিশ্রিত হত অর্থাৎ এ শিষ্ট সাধারণ আদর্শের উপভাষাগত বিভেদ তখনও পরিলক্ষিত হয়নি। তাই মধ্য বাঙলাসুলভ সাধু আদর্শে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সমানভাবে প্রতিফলিত হত, যেমন অতীতকালে উত্তম পুরুষ বিভক্তি—ইলাম (পুর্বী), ইলুম, ইলোঁ, ইলুঁ, (রাঢ়ী/বরেন্দ্রী) এবং ভবিষ্যৎকালে উত্তম পুরুষ বিভক্তি-ইবাম (পুর্বী), ইবোঁ, ইব (রাঢ়ী) অথবা মুখ্য/গৌণ কর্মে-কে (রাঢ়ী), র (পুর্বী) অধিকরণে-তে (রাঢ়ী), -ত (বরেন্দ্রী), -ত/-তে (পুর্বী) ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক রাঢ়ী গদ্য সাহিত্যের ভাষাচিত্রে দেখা গেল, সর্ববঙ্গীয় ভাষালক্ষণগুলি গ্রহণ বর্জন রীতি অনুসারে চিহ্নিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে গৌড়ীয় উপভাষার বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ আঞ্চলিক ধর্মরূপে শিষ্ট আদর্শের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। অপরদিকে দোম ও মনোএল-এর রচনায় পুর্বী আঞ্চলিক লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হলেও সর্ববঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য কচিৎ রয়ে গেছে। এ লক্ষণগুলি রাঢ়ীর সমধর্মী হলেও মূলত কিন্তু এগুলি পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার উপর রাঢ়ী প্রভাব নয়, তা হল আসলে সার্বজনীন সর্ববঙ্গীয় মধ্য বাঙলা লক্ষণেরই অবশেষ।'[১৮]

অতএব, এ সূত্র ধরেও ময়মনসিংহ-গীতিকার ভাষা আদৌ কৃত্রিম একথা বলাতো যায়ই না বরং সামগ্রিকভাবে উক্ত গীতিকার অকৃত্রিমতাকেও অস্বীকার করা অসম্ভব। আর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে উক্ত গীতিকার মত একটি গীতিকাও পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ এযাবৎ ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলা একাডেমী কর্তৃক গীতিকা সংগৃহীত হচ্ছে এবং সেগুলোর ভাষা-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ময়মনসিংহ-গীতিকার ভাষা-বৈশিষ্ট্য ও ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা-বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করেও তার প্রমাণিকতা, অকৃত্রিমতা এবং অনন্যতা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব নয়।

---

১৮ পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাঙলাভাষা পরিক্রমা। প্রকাশক: প্রশান্ত ভট্টাচার্য, স্বারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩, পৃ ১১৯-২০